ইউনিট ৬

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ বা বিপ্লব

ভূমিকা

ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে (১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রি:) মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদী আন্দোলন বা বিদ্রোহ সংঘটিত হতো। কিন্তু এতে সামগ্রিকভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব এত ব্যাপক আকারে ঘটে যে তা বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ভিতকে কাঁপিয়ে তোলে। প্রাথমিকভাবে কোম্পানীর দুঃশাসন ও নির্যাতনের শিকার দেশীয় সিপাহীরা এ বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটায়। পরবর্তী কালে তা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় এক বছর কাল স্থায়ী এই গণবিদ্রোহে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণ অংশ নেয় ও সহযোগিতা প্রদান করে। বিদেশী শাসন শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিদ্রোহের মূলে কাজ করেছিল। বিপ্লবী জনতা বৃটিশ শাসনকে অগ্রাহ্য করে শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের প্রকৃত শাসক বলে ঘোষণা দেয়। তা ছাড়া নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী, ঝাঁসীর রাণী, কুনওয়ার সিং, মৌলভী আহমদ উল্লাহ প্রমুখ নেতা গণবিপ্লবে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা কারণে এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে বিপ্লব সফল না হলেও পরিণতিতে ভারতে কোম্পানী শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতের শাসন ক্ষমতা বৃটিশ রাজের কাছে হস্তান্তরিত হয়।

এ ইউনিট পাঠ করে আপনি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের প্রকৃতি, বিপ্লব কেন সংঘটিত হয়েছিল, বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণসমূহ এবং উক্ত সাড়া জাগানো ঐতিহাসিক ঘটনার ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পাঠ ১

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবের স্বরূপ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের প্রকৃতি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- বিপ্লব সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক ও ঐতিহাসিকদের মতামত বর্ণনা করতে পারবেন।
- লেখক ও ঐতিহাসিকদের মত পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিপ্লবের প্রকৃতি

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে সমকালীন ও আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইংরেজ ও ভারতীয় ঐতিহাসিকদের অনেকেই একে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। উৎস ও ঘটনাবলীর বিবেচনায় কারও মতে এটি ছিল নিছক একটি সিপাহী বিদ্রোহ, কারও মতে জাতীয় সংগ্রাম, আবার কারও মতে কৃষক আন্দোলন। ভিন্ন একটি মত হচ্ছে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহ ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশীয় সামন্ত প্রভুদের শেষ প্রতিরোধ। সমসাময়িক ইংরেজদের মধ্যেও এর স্বরূপ নিয়ে মতভেদ ছিল। তদানীন্তন

বিপ্লবের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে মতভেদ

ভারত সচিব আর্ল স্ট্যানলি তাঁর লেখায় সিপাহী বিদ্রোহ কথাটি ব্যবহার করলেও ঐ সময়ে বৃটিশ পার্লামেন্টে এক ভাষণে ডিজরেলী উক্ত ঘটনাকে বর্ণনা করেন জাতীয় বিদ্রোহ হিসেবে। স্যার লরেন্স একে দেশীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ বলে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে আউটরাম একে একটি সুপরিকল্পিত বৃটিশ বিরোধী ষড়যন্ত্র বলে মত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, ঘটনাসমূহের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটান। তাছাড়া ইংরেজ কর্মচারীদের অন্য একটি অংশ এ বিপ্লবকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমান সম্প্রদায়ের চক্রান্ত বলে বর্ণনা করেছেন। আলফ্রেড লায়লের ভাষায়, "পুরো বিদ্রোহটাই মুসলমানদের একটা ষড়যন্ত্র এবং সিপাহীরা হলো তাদের হাতের পুতুল মাত্র"। ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেভ ব্রাউন, টি.খালদুন, আই.এইচ. কোরেশী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও মুসলিম চক্রান্তের কথা বলেছেন।

বিপ্লবের চরিত্র নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতামত

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের চরিত্র যাচাই করতে গিয়ে ঐতিহাসিকগণ সর্বত্রই জোরালো ভাষায় তাঁদের নিজস্ব মতামত ও যুক্তি তুলে ধরেন এবং তাঁদের বিশ্লেষণ থেকে মোটামুটি দুটি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়। চালর্স রেক্স, জন কে, পি.ই রবার্টস প্রমুখ ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে এটি সিপাহী বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই বিদ্রোহকে জাতীয় সংগ্রাম রূপে দেখার কোন যুক্তি নেই বলে তাঁরা মনে করেন। সমসাময়িক ভারতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্যার সৈয়দ আহমদ খান, কিশোরী চাঁদ মিত্র, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ মনে করেন এটি ছিল কেবলমাত্র সিপাহীদের বিদ্রোহ। তাঁদের যুক্তি হলো, এই বিদ্রোহের পেছনে কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য বা পরিকল্পনা ছিল না। কোন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের কথা তারা চিন্তা করেনি। তাছাড়া ভারতের সর্বত্র এ বিপ্লবের প্রভাবও পড়েনি। সমাজের সব স্তরের মানুষ এতে যোগ দেয়নি। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিপ্লবের বিরোধিতাই করেছিল। তাছাড়া অভ্যুত্থানে কোন সর্বভারতীয় চরিত্র না থাকায় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবকে একটি জাতীয় আন্দোলন হিসেবে তাঁরা মেনে নিতে চান না।

জাতীয় সংগ্রাম না সিপাহী বিদ্রোহ

বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করা

ঐতিহাসিকদের আরেকটি দল জে.বি. নর্টন, ডক্টর ডাফ, সুশোভন চন্দ্র সরকার প্রমুখের মতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব প্রথমত সিপাহী বিদ্রোহ রূপে শুরু হলেও পরে তা ব্যাপকতা এবং জাতীয় আন্দোলনের চরিত্র লাভ করে। এই মতকে আরো সম্প্রসারিত করে সাভারকার ও শশীভূষণ চৌধুরী ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবকে জাতীয় স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে এ বিদ্রোহের লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করা। বিদ্রোহ শুধুমাত্র ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভারতবর্ষের সর্বত্র এর প্রভাব না পড়লেও বাংলা প্রেসিডেন্সির অংশ সহ উত্তর ভারতের বিশাল এলাকায় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ফলে এটি জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। সাম্প্রতিক কালে আরো দুজন ভারতীয় ঐতিহাসিক একটু ভিন্নভাবে এ বিপ্লবের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। ডঃ সুরেন্দ্র নাথ সেনের মতে বিপ্লব প্রথমে দেশীয় সিপাহীদের মধ্যে শুরু হলেও পরে এটি কেবল তাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে বিদ্রোহীদের পেছনে জনসাধারণের সমর্থন ছিল। ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার সার্বিক ভাবে একে জাতীয় সংগ্রাম বা স্বাধীনতার লড়াই বলতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে মূলত এটি ছিল সিপাহীদেরই বিদ্রোহ। তবে কোন কোন অঞ্চলে স্থানীয় জনগণের সমর্থন বা সহানুভূতির কারণে তা গণ বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব সিপাহী বিদ্রোহ বা রাজনৈতিক সংগ্রাম যাই হোক না কেন, এটা ঠিক যে- এর পূর্বে ভারতের এত বিশাল অঞ্চল জুড়ে মানুষের

সংঘবদ্ধ ও ব্যাপক বিদেশী বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটেনি এবং এত দীর্ঘ সময় ধরে তা স্থায়ীও হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে এ জাগরণ ছিল স্বত:স্ফূর্ত এবং বিদ্রোহ দমনের কালে এর জনপ্রিয়তা প্রকাশ পায়। ইংরেজ বাহিনী শুধুমাত্র বিদ্রোহী সিপাহী বা বিদ্রোহে নেতৃত্বদানকারী জমিদার তালুকদার ও অভিজাতদের দমন করেই ক্ষান্ত হয়নি। দিল্লী, অযোধ্যা, আগ্রা, পশ্চিম বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরেজ বাহিনী গ্রামের পর গ্রাম ও শহরের পর শহর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় এবং অগণিত মানুষকে হত্যা করে। বিপ্লবের এই ধ্বংসাত্মক রূপ লক্ষ করে রেভারেন্ড ডাফ মন্তব্য করেছিলেন যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের অভ্যুত্থানকে নিছক সামরিক বিদ্রোহ বলা যায় না— এটি ছিল একটি বিপ্লব।

সার-সংক্ষেপ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে যে বিপ্লব সংঘটিত হয়, এর স্বরূপ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ পরস্পর বিরোধী মত পোষণ করেন। অনেক ঐতিহাসিক বিশেষ করে বৃটিশ ঐতিহাসিক ও সমকালীন ইংরেজ কর্মচারীদের মতে ১৮৫৭ সালের এ অভ্যুত্থান ছিল দেশীয় সিপাহীদের বিদ্রোহ। পক্ষান্তরে অন্য একদল ঐতিহাসিক বিশেষত ভারতীয় ঐতিহাসিক ও লেখকদের মতে এটি ছিল বৃটিশ শাসন অবসান কল্পে প্রথম জাতীয় সংগ্রাম বা স্বাধীনতার লড়াই। কেউ কেউ একে সামন্তশ্রেণীর প্রতিরোধ বলেও মনে করেন। এ সব কোন মতই পরিপূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য বা ভিত্তিহীন নয়। এসব বক্তব্যের প্রত্যেকটির মধ্যে আংশিক সত্য অবশ্যই রয়েছে। এ নিয়ে বাদানুবাদের অবসান এখনো ঘটেনি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৭.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. ভারত সচিব আর্ল স্ট্যানলি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবকে বলেছেন —
   ক. সামন্ত প্রভুদের প্রতিরোধ খ. সিপাহী বিদ্রোহ
   গ. কৃষক বিদ্রোহ ঘ. গণযুদ্ধ

২. ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব —
   ক. সমর্থন করেছিলেন খ. বিপ্লব থেকে দূরে ছিলেন
   গ. বিরোধিতা করেছেন ঘ. কিছুই করেননি

৩. নিম্নের দু'জন ঐতিহাসিক ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবকে স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন —
   ক. চার্লস রেক্স ও জন জে খ. কিশোরী চাঁদ মিত্র ও দুর্গদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
   গ. জে.বি নর্টন ও সুশোভন চন্দ্র সরকার ঘ. সাভারকার ও শশী ভূষণ চৌধুরী

৪. '১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের অভ্যুত্থান কোন সামরিক বিদ্রোহ ছিল না, ছিল এক বিপ্লব'- এই উক্তিটি করেছেন —
   ক. রেভারেন্ড ডাফ খ. আউটরাম
   গ. আলফ্রেড লায়েল ঘ. ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের প্রকৃতি কি ছিল?
২. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের চরিত্র নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতামত উল্লেখ করুন?

পাঠ ২

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবের কারণসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের কারণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিপ্লবের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।

ভারতবর্ষে গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং-এর শাসনকালের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ বা বিপ্লব। বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর দেশীয় সিপাহীদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভের কারণে সৃষ্ট বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই গণবিদ্রোহ বৃটিশ শাসনকে প্রায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তবে এই গণবিদ্রোহ শুধু যে সিপাহীদের অসন্তোষের ফল তা নয়। এর মূলে ছিল কোম্পানীর অনুসৃত নীতি ও বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও হতাশা। ভারতীয় জনগণের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মধ্যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠে এবং তা থেকেই বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটে।

কোন একটি বিদ্রোহ বা বিপ্লব একদিনে বা একটি কারণে সংঘটিত হয় না। এর পেছনে থাকে নানাবিধ কারণ। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের পেছনেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভৃতি কারণ ছিল। এছাড়াও কোন কারণকে প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

রাজনৈতিক কারণ

লর্ড ডালহৌসির দেশীয় রাজ্য গ্রাস করার নীতি

লর্ড ডালহৌসির সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগ দ্বারা তিনি সাঁতারা, ঝাঁসি, সম্বলপুর ও নাগপুর রাজ্য দখল করেন। তাঞ্জোর ও কর্নাটকের নবাবের বৃত্তি এবং পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীয়াও-এর দত্তক পুত্র নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করে দেন। অযোধ্যা রাজ্যটি কুশাসনের অভিযোগে গ্রাস করা হয় এবং অমানুষিক অত্যাচার ও বর্বরতার সাথে দখলকৃত অযোধ্যা ও নাগপুরের রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করা হয়। এর ফলে নানা সাহেব ও ঝাঁসির রাণী বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেন এবং সাঁতারা ও নাগপুরের রাজপরিবারগুলো বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়ে উঠে। ডালহৌসি মোগল সম্রাটের উপাধি পর্যন্ত কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। তা ছাড়া ইংরেজ কর্মচারীদের অত্যাচার ও কুশাসনের কারণে ভারতীয়দের মধ্যে বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক কারণ

ভারতের ধন সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচারে, জনগণের দুর্দশা বৃদ্ধি

ইংরেজ কোম্পানি শাসনে ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যয় বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। পলাশীর পর থেকে প্রায় একশ বছর ধরে ইংরেজরা ভারত থেকে সোনা, রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু ও অপরিসীম ধনসম্পদ নিজেদের দেশে পাচার করে। ভারতবর্ষকে বিলাতী পণ্যের বাজার হিসেবে গড়ে তোলা হয়। অবাধভাবে বৃটিশ পণ্য আমদানির ফলে আস্তে আস্তে দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে বহু লোক বেকার হয়ে পড়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তসহ নতুন ভূমি ব্যবস্থায় কৃষকদের উপর অসম্ভব করের বোঝা চাপান হয়। বহু লাখেরাজ সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করে। ইংরেজ কর্তৃক অযোধ্যা দখলের পর সেখানকার বহু তালুকদার জমির মালিকানা হারান। এভাবে ইংরেজদের শোষণ নীতির কারণে জনগণের দুর্দশা ও দুরবস্থা চরমে উঠলে তারা বিদেশী শাসন বিরোধী হয়ে উঠে।

সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ

সামাজিক সংস্কার প্রচেষ্টা ও খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্ম প্রচার

বিজিত ভারতবাসী এবং বিজেতা ইংরেজদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের মনোভাব থাকায় উভয়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়। সে কারণে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ আইন, শিশু হত্যা নিবারণ, নারী শিক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি সংস্কার মূলক পদক্ষেপ সনাতনপন্থী হিন্দুদের মনে সন্দেহ ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে। খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম প্রচার, জেলখানার কয়েদীদের কাছে পাদরীদের যাতায়াত এবং অসহায় ও গরীবদের শিক্ষা-দীক্ষায় আর্থিক সহায়তা দান হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন আশংকার সৃষ্টি করে যে, ইংরেজদের উদ্দেশ্য হলো ভারতবাসীদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা। রেলপথ বিস্তার ও টেলিগ্রাফের প্রবর্তন একই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলে তারা সন্দেহ পোষণ করে।

সামরিক কারণ

ভারতীয় সিপাহীদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল সিপাহীদের অসন্তোষ। যে সিপাহীরা ছিল বৃটিশ রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ। নানাবিধ কারণে তারাও বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ইউরোপীয়দের তুলনায় ভারতীয় সৈনিকদের বেতন ছিল খুবই কম। পদোন্নতির ক্ষেত্রেও তারা বৈষম্যের শিকার হতো। সামরিক কারণে দূরদেশে অবস্থান কালে ইংরেজ সৈনিকরা ভাতা পেত। কিন্তু ভারতীয় সিপাহীরা তা থেকে বঞ্চিত ছিল। বৃটিশ অফিসারদের দুর্ব্যবহার, উদ্ধত ও অপামানজনক আচরণে দেশীয় সৈনিকদের মধ্যে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হয়। সিপাহীদের মধ্যে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারে উৎসাহ দেয়া, কপালে তিলক লেপন, দাঁড়ি রাখা ও পাগড়ী পরা নিষিদ্ধ করা, কালাপানি অর্থাৎ সমুদ্র পাড়ি দিতে বাধ্য করা ইত্যাদির কারণে তাদের ধর্ম বিশ্বাসেও আঘাত লাগে এবং তারা ক্রমশ ক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে।

প্রত্যক্ষ কারণ

এনফিল্ড রাইফেলের ব্যবহার

বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ হল চর্বি মিশ্রিত কার্তুজের প্রবর্তন। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে সেনাবাহিনীতে এনফিল্ড রাইফেল নামে এক ধরনের বন্দুকের ব্যবহার শুরু হয়। ব্যবহারের পূর্বে এর কার্তুজ দাঁত দিয়ে কাটতে হতো। গুজব রটে যে, উক্ত রাইফেলে গরু ও শুকরের চর্বি মিশ্রিত কার্তুজের প্রচলন করে বৃটিশ সরকার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম নাশ করার ষড়যন্ত্র করছে। ফলে দেশীয় সিপাহীদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ ব্যারাকপুর সেনানিবাসে মঙ্গল পান্ডে নামে এক সিপাহী প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ করে। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ মঙ্গল পান্ডে এবং তার একজন সমর্থককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে বিদ্রোহের আগুন নেভাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এরপর মে মাসে বড় আকারের বিদ্রোহ দেখা দেয় মীরাটের সেনা ছাউনিতে। সিপাহীরা সরকারী নির্দেশ অমান্য করে এবং কর্নেল ফিনিসকে গুলি করে হত্যা করার পর প্রকৃত বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে।

সার-সংক্ষেপ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব শুধুমাত্র যে সিপাহীদের অসন্তোষের ফল তা নয়। এর পেছনে ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা ও অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সৃষ্ট অসন্তোষ ও ক্ষোভ। বিপ্লবের কারণসমূহকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক,

ধর্মীয় ও সামাজিক এবং প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বিদেশী শাসন শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ এ বিপ্লবের মাধ্যমেই ঘটে ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৭.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন —
   ক. লর্ড ডালহৌসি খ. লর্ড কার্জন
   গ. লর্ড ক্যানিং ঘ. লর্ড কর্ণওয়ালিস

২. স্বত্ব বিলোপ নীতি প্রয়োগ করেন —
   ক. ওয়ারেন হেস্টিংস খ. লর্ড ওয়েলেসলি
   গ. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক ঘ. লর্ড ডালহৌসি

৩. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল —
   ক. সামাজিক খ. এনফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন
   গ. অর্থনৈতিক ঘ. রাজনৈতিক

৪. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সেনা বিদ্রোহ সংঘটিত হয় —
   ক. ব্যারাকপুরে খ. দিল্লীতে
   গ. কলিকাতায় ঘ. ঢাকায়

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের রাজনৈতিক কারণসমূহ বিশ্লেষণ করুন।
২. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের সামাজিক ও ধর্মীয় কারণসমূহ বর্ণনা করুন।
৩. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ কি ছিল?

পাঠ ৩

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব সফল না হওয়ার বিবরণ দিতে পারবেন।
- বিপ্লবের সময় ইংরেজ পক্ষের শক্তি ও সুবিধাসমূহ কি ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিপ্লবের পক্ষের শক্তির দুর্বলতা ও অসুবিধাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব-এর ব্যাপকতা ও সময়ের দিক বিবেচনায় ছিল এক বিরাট প্রতিরোধ সংগ্রাম বা গণ বিদ্রোহ। বিদ্রোহীদের তৎপরতা ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানোর উপক্রম করে। কিন্তু নানাবিধ কারণে শেষ পর্যন্ত এ বিপ্লব সফল হয়নি। এর ব্যর্থতার কারণগুলো নিম্নরূপ:

পূর্ব পরিকল্পনার অভাব

পরিকল্পনাহীন অসংবদ্ধ বিপ্লব

এই বিপ্লব পূর্ব পরিকল্পিত ছিল না এবং কোন রকম পরিকল্পনা অনুসারে কার্যকরীও হয়নি - বিদ্রোহীদের কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থাও ছিল না। বিভিন্ন স্থানে নেতৃবৃন্দ বিচ্ছিন্নভাবে এই বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। উপযুক্ত যোগাযোগ বা সংহতি তাঁদের মধ্যে ছিল না। ফলে একই সময়ে সকল জায়গায় অভ্যুত্থান যেমন ঘটেনি, তেমনি সর্বত্র একই পদক্ষেপ বা কর্মপন্থা অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী নেতাদের মধ্যে আদর্শ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান থাকায় সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁরা ব্যর্থ হয়। নানা সাহেবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পেশোয়া পদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। অন্যদিকে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ যাঁকে বিদ্রোহীরা নেতা নির্বাচন করে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মোগল সম্রাটের হারানো শক্তির পুনরুদ্ধার করা। উভয়ের উদ্দেশ্য স্পষ্টতই ছিল পরস্পর বিরোধী। ঝাঁসীর রাণী লক্ষীবাঈও নিজের হারানো রাজ্য ফিরে পাবার চেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছিলেন।

নেতাদের মধ্যে আদর্শ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব

সংঘবদ্ধতার অভাব

সকল অঞ্চলের ভারতীয় সিপাহীরা বিপ্লবে অংশ নেয়নি

এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার অন্যতম কারণ ছিল এতে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ যোগ দেয়নি। তা ছাড়া বিদ্রোহীদের প্রতি অনেকের সমর্থনও ছিল না। যদিও কয়েকটি অঞ্চলে বিদ্রোহ প্রকট আকার ধারণ করেছিল, তথাপি তা ছিল সীমাবদ্ধ প্রকৃতির। উত্তর প্রদেশ, অযোধ্যা, রোহিলাখণ্ড এবং বাংলা ও বিহারের পশ্চিমাঞ্চলেই বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ থাকে। দক্ষিণ ভারতের বিশাল এলাকায় এর বিস্তৃতি ঘটেনি। ভারতবর্ষের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং দেশীয় রাজণ্যবর্গের বড় অংশ এই বিদ্রোহ থেকে নিজেদের দূরে রাখে।

অন্যদিকে দেশীয় নৃপতিদের অনেকেই সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ সেনাবাহিনীকে সাহায্য করে। হায়দ্রাবাদের নিজাম, কাশ্মীরের মহারাজা এবং মারাঠা অধিপতি সিন্ধিয়ার ভূমিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্যযোগ্য। লর্ড ক্যানিং এ সময় বলেছিলেন যে, যদি মারাঠা নেতা সিন্ধিয়া এই বিদ্রোহে যোগ দেয় তাহলে ইংরেজকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে। এটা বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে, কাশ্মীরের মহারাজার করুণার উপর তখন পাঞ্জাবে ইংরেজদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল। বিপ্লবের সময়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা অর্থাৎ শিখ ও গুর্খা বাহিনী এবং কিছু সংখ্যক রাজপুত যোদ্ধা সিপাহীদের পক্ষ না নিয়ে বরং ইংরেজদের সাহায্যে এগিয়ে যায়।

দক্ষ নেতৃত্বের অভাব

কেন্দ্রীয় সংগঠনের মাধ্যমে বিদ্রোহ পরিচালিত হয়নি

বিদ্রোহীদের মধ্যে সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব ছিল। নেতাদের অধিকাংশই বিদ্রোহের যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ হন। ঝাঁসির রাণী, নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী, কুনওয়ার সিং প্রমুখ নেতৃবৃন্দ স্ব-স্ব এলাকায় সুযোগ্য নের্তৃত্বের পরিচয় দিলেও ব্যাপক বিদ্রোহের সার্বিক নেতৃত্বদানের ক্ষমতা তাঁদের কারও ছিল না। তা ছাড়া কোন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা বা কেন্দ্রীয় সংগঠনের মাধ্যমে এ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়নি। ফলে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত চেষ্টাগুলো সহজেই ইংরেজদের পক্ষে দমন করা সম্ভব হয়েছিল।

ইংরেজদের সামরিক শক্তি

ইংরেজদের উন্নত সামরিক ও রণকৌশল

ইংরেজদের সামরিক সংগঠন ও রণকৌশল তাদের প্রতিপক্ষের চেয়ে উন্নততর ছিল। তাদের অস্ত্রশস্ত্রও ছিল আধুনিক ও উন্নত ধরনের। বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দের তুলনায় ইংরেজ সেনাপতিরা ছিলেন অধিক দক্ষ, সাহসী ও রণকৌশলী যোদ্ধা। লরেন্স, আউটরাম বা নিকলসনের মতো নির্ভিক ও সমরকুশলী বিদ্রোহীদের মধ্যে কেউই ছিলেন না।

বিদ্রোহীদের প্রয়োজনীয় শক্তির অভাব

ইংরেজদের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত যুদ্ধাস্ত্র

যুদ্ধাস্ত্র এবং শক্তির দিক থেকেও বিদ্রোহীরা দুর্বল ছিল। তাদের প্রধান হাতিয়ার ছিল গাদা বন্দুক। বিপরীতে ইংরেজ বাহিনী ছিল আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত ও উন্নত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। রেলপথে দ্রুত সৈন্য প্রেরণ , টেলিগ্রাফের সাহায্যে অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় বার্তা পৌঁছানো ইত্যাদি ব্যবস্থা বিদ্রোহ দমনে তাদের প্রভূত সাহায্য করে। তদুপরি বৃটিশ নৌবাহিনী পারস্য ও মালয় থেকে প্রয়োজনীয় সৈন্য ও গোলাবারুদ এনে স্বপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করে। ফলে দেশীয় সিপাহীরা তাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল ব্যাপী সংঘর্ষ চালাতে ব্যর্থ হয়।

সার-সংক্ষেপ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কারণে ব্যর্থ হয়। এ বিপ্লবের পেছনে কোন পূর্ব পরিকল্পনা না থাকায় ঐক্যবদ্ধ কোন কর্মপন্থা বা সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। দুর্বল নেতৃত্ব, আঞ্চলিক ও বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ, উপযুক্ত সাংগঠনিক শক্তির অভাব, নিম্নমানের সমরাস্ত্র ও দুর্বল রণকৌশল বিদ্রোহীদের পরাজয়কে অবধারিত করে তোলে। অন্যদিকে ইংরেজদের দক্ষ নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত সামরিক শক্তি তাদের গলায় বিজয়ের মুকুট পরিয়ে দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৭.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

১. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবে অংশ গ্রহণের পেছনে নানা সাহেবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—
   ক. দিল্লী দখল করা
   খ. পেশোয়া পদের পুন:প্রতিষ্ঠা
   গ. সিপাহীদের জেল থেকে মুক্ত করা
   ঘ. বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটানো

২. ঝাঁসির রানী ছিলেন —
   ক. ভিক্টোরিয়া
   খ. নূরজাহান
   গ. দেবী চৌধুরানী
   ঘ. লক্ষ্মীবাঈ

৩. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা ছিল —
   ক. বিপ্লবে সমর্থন জোগান
   খ. ইংরেজদেরকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা
   গ. বিপ্লবী কর্মকান্ড থেকে নিজদেরকে দূরে রাখা
   ঘ. অস্ত্র হাতে লড়াই করা

৪. বিপ্লবের সময় শক্তিশালী মারাঠা অধিপতি ছিলেন —
ক. শিবাজী খ. সিন্ধিয়া
গ. রঘুজী ভোঁসলে ঘ. দ্বিতীয় বাজীরাও

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন:

১. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব কেন সফল হয়নি?
২. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবে বিদ্রোহীদের সমস্যা কোথায় ছিল?

পাঠ ৪

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের ফলাফল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি —

- ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের পরে ভারতের অবস্থা কি হয়েছিল, বিবরণ দিতে পারবেন।
- বৃটিশ সরকারের নীতি ও শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিপ্লবের আশু ও সুদূর প্রসারী প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

কোম্পানী শাসনের অবসান

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব বৃটিশ ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। নানাবিধ কারণে সে গণবিপ্লব ব্যর্থ হলেও এর ফলে ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসনের অবসান ঘটে। কোম্পানী থেকে বৃটিশ রাজের হাতে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর ইংরেজদের ভারত শাসন নীতি ও শাসন ব্যবস্থায় বেশ কিছু পরিবর্তন সূচিত হয়। বৃটিশ সরকার স্পষ্টত অনুধাবন করে যে, একটি বণিক সম্প্রদায়ের হাতে ভারতের ন্যায় এত বড় সাম্রাজ্যের শাসন ভার ছেড়ে দেয়া নিরাপদ নয়। সে কারণে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২ আগস্ট বৃটিশ পার্লামেন্ট এক আইন পাশ করে ভারতের শাসনভার ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে অর্পণ করে। কোম্পানীর ডাইরেক্টর সভার কর্তৃত্ব বিলোপ করা হয়। পূর্বেকার বোর্ড অব কন্ট্রোলের স্থলে বৃটিশ কেবিনেট মন্ত্রীদের মধ্য থেকে একজনকে ভারত সচিবের পদে নিযুক্ত করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়, তিনি পনের সদস্য নিয়ে গঠিত একটি কাউন্সিলের সাহায্যে ভারত শাসন করবেন। ভারত সরকারের নির্বাহী প্রধান গভর্নর জেনারেল এখন থেকে রাজ প্রতিনিধি হিসেবে ভাইসরয় উপাধি লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, তদানিন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন।

ভারতের শাসনভার ইংল্যাণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে অর্পণ

রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র

ভারতীয়দের মনে ইংরেজ সরকারের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক রাজকীয় ঘোষণা প্রচারিত হয়। রাণীর ঘোষণায় দেশীয় রাজাদের আশ্বাস দেয়া হয় যে, বৃটিশ সরকার আর কোন ভারতীয় রাজ্য গ্রাস করবে না। পূর্বেকার রাজ্য বিস্তার নীতি সরকার বর্জন করবে। দেশীয় রাজণ্যবর্গের মর্যাদা, অধিকার এবং প্রচলিত রীতিনীতি রক্ষা করা হবে। দত্তকপুত্র গ্রহণের রীতি প্রচলিত থাকবে এবং স্বত্ববিলোপ

ভারতীয় রাজ্য গ্রাস না করার নীতি গ্রহণ

নীতি পরিত্যক্ত হবে। বৃটিশ সরকার দেশীয় রাজ্যগুলোর অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা রক্ষার জন্য দায়ী থাকবেন।

ভারতীয়দের সরকারি চাকুরিতে সুযোগ প্রদান এবং এদেশের সামাজিক প্রথা ও ধর্মে হস্তক্ষেপ না করার আশ্বাস

মহা রাণীর ঘোষণাপত্রে এ কথাও বলা হলো যে, একমাত্র বৃটিশ নাগরিক ও প্রজাদের হত্যাকান্ডের সংগে সরাসরি জড়িত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য সকলকে বিদ্রোহে অংশ গ্রহণের দায় থেকে মুক্তি দেয়া হবে। যোগ্যতা অনুসারে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয়দেরকে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ করা হবে। বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর সামাজিক প্রথা ও ধর্মে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবেন।

শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন

বিকেন্দ্রীকরণ নীতি

ভারত শাসনের জন্য আরও কিছু শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন আনা হয়। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ মাদ্রাজ ও বোম্বে কাউন্সিলের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রহিত করে তা কলকাতা কাউন্সিলের উপর অর্পণ করে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পরে এই কেন্দ্রীয়করণ নীতি পরিত্যক্ত হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের কাউন্সিল এ্যাক্টের মাধ্যমে বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলকে আইন প্রণয়নের অধিকার প্রত্যর্পণ করা হয়। নতুন কোন প্রদেশ গঠিত হলে ঐ প্রদেশের জন্য আইন সভা এবং সেখানে ভারতীয় সদস্য মনোনয়নের বিধানও গৃহীত হয়।

সেনাবাহিনী ও অর্থনীতির উপর প্রভাব

সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ব্যাপারে বৈষম্য

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে ভারতের সেনাবাহিনী ও অর্থনীতির উপর। হাজার হাজার বিদ্রোহী সিপাহীদের হত্যা করে ও ফাঁসিতে ঝুলিয়ে বৃটিশ সরকার বিদ্রোহের চরম প্রতিশোধ নেয়। ভবিষ্যতে সৈন্যবাহিনীতে যেন আর কোন বিদ্রোহ ঘটতে না পারে সে জন্য কতিপয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সেনাবাহিনী অবলুপ্ত করে তা পুনর্গঠন করা হয়। গোলন্দাজ বাহিনীতে ভারতীয়দের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয় এবং উচ্চপদে তাদের পদোন্নতি বন্ধ রাখা হয়। অযোধ্যা ও বেনারস থেকে সৈনিক নিয়োগ নিরুৎসাহিত করে তার পরিবর্তে বিপ্লবকালে অনুগত অঞ্চল পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান ও নেপাল থেকে সামরিক জাতি বলে চিহ্নিত শিখ, পাঠান ও গুর্খাদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া শুরু হয়। সেনাবাহিনীতে ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা বাড়ানো হয় এবং দেশীয় সৈন্য সংখ্যা যাতে তাদের দ্বিগুণের বেশি না হয়, সে দিকেও সরকার মনোযোগী হন। তাছাড়া সেনাবাহিনীর মধ্যে জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বিভেদ বজায় রাখার কৌশল অবলম্বন করা হয়। এ সবের ফল হিসেবে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে নতুন নতুন করের বোঝা এদেশবাসীর উপর চাপানো হয়। ঔপনিবেশিক নীতির প্রয়োগ হিসেবে ভারতবর্ষে বৃটিশ পণ্যের অবাধ বাজার তৈরি হওয়ায় এ দেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

এদেশের অর্থনীতিতে আঘাত

মুঘল সম্রাটের আইনানুগ অধিকার বিলুপ্ত

বাহাদুর শাহ জাফর নির্বাসিত

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের পরে মোগল সম্রাটের আইনানুগ অধিকারের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। বিদ্রোহী সিপাহীরা যাঁকে নেতা বলে ঘোষণা করেছিল, সেই দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর বন্দী হয়ে রেঙ্গুনে নির্বাসিত হলেন এবং তাঁর পুত্র ও পৌত্রদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

পরোক্ষ প্রভাব

বিপ্লবের একটা পরোক্ষ প্রভাব ছিল শাসক-শাসিতের সম্পর্কের উপর। বিদ্রোহের সময় উভয় পক্ষ চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়। ফলে উভয়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও দূরত্ব বাড়ে। সহযোগিতার পরিবর্তে বৃটিশের বিরুদ্ধে ক্রমশ ভারতবাসীর বিরোধিতা শুরু হয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী চাকুরীসহ দেশ শাসনে অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হতে থাকে। ফলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় জাতীয় চেতনা ও দেশাত্মবোধ।

সার-সংক্ষেপ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের পরে ভারতে এক বছরের (১৭৫৭-১৮৫৭) কোম্পানী শাসনের অবসান ঘটে। উপমহাদেশের শাসনভার বৃটিশ রাজ ও পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয়। বৃটিশ কেবিনেটের একজন সদস্য ভারত সচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত হয় শাসন কার্যে তাঁকে সাহায্য করবে ১৫ সদস্যের একটি কাউন্সিল। বৃটিশ সরকার তার সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির অবসান ঘোষণা করে। দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণের অধিকার ক্ষুণ্ন না করে। ভারতীয়দের প্রতি ন্যায় বিচারের পূর্ণ আশ্বাস প্রদান করা হয়। বিদ্রোহের ঝুঁকি এড়াবার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করে ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা বাড়ান হয়। ভারতে মুগল সম্রাটের আইনানুগ কর্তৃত্বের পরিপূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৭.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. বৃটিশ সরকার ভারত শাসনের দায়িত্ব হাতে নেয় —
   ক. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে খ. ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে
   গ. ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ঘ. ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে

২. ভারতের প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হয়েছিলেন —
   ক. লর্ড আমহার্স্ট খ. লর্ড কার্জন
   গ. লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘ. লর্ড ক্যানিং

৩. ইংরেজরা রেঙ্গুনে নির্বাসিত করেছিল —
   ক. দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ কে খ. কামাল আতাতুর্ক কে
   গ. কুনওয়ার সিং কে ঘ. মৌলভী আহমদ উল্লাহ্ কে

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নঃ

১. কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটানোতে ১৮৫৭ সালের বিপ্লব কি ভূমিকা রেখেছিল?
২. ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্রে শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন এসেছিল?

চূড়ান্ত মূল্যায়ন-৭ ঃ রচনামূলক প্রশ্নঃ

১. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের স্বরূপ আলোচনা করুন।
২. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের কারণসমূহ পর্যালোচনা করুন।
৩. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের ব্যার্থতার কারণসমূহ কি ছিল?

৪. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব পরবর্তী ভারতে বৃটিশ সরকারের নীতি ও শাসন ব্যবস্থার বর্ণনা দিন।

৫. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা করুন।

উত্তরমালাঃ

পাঠ - ৭.১	⇒	১. খ	২. গ	৩. ঘ	৪. ক
পাঠ - ৭.২	⇒	১. গ	২. ঘ	৩. খ	৪. ক
পাঠ - ৭.৩	⇒	১. খ	২. ঘ	৩. গ	৪. খ
পাঠ - ৭.৪	⇒	১. খ	২. ঘ	৩. গ	৪. ক